যদি ভুলে যাই...

শাহাদত চৌধুরী

একটি প্রশ্ন পরিচিতজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহযোদ্ধা করে থাকেন, আমি যুদ্ধ-সময়ের কথা লিখছি না কেন? আমি সহজ উত্তর দেই, 'এখনো সময় করতে পারছি না'। উত্তরটা মিথ্যে নয় পুরোপুরিভাবে। আমি একাত্তরের নয় মাসকে প্রত্যক্ষ করতে চাই বড় ক্যানভাসে। যার জন্যে সময় তো প্রয়োজনই। কেন লিখছি না, এ প্রশ্ন নিজেকে করলে উত্তর পাই না। তখন আবারো প্রশ্ন জাগে 'যদি ভুলে যাই'?... 'ভুলে যাওয়া কি সম্ভব'?

এ দুটো প্রশ্নের প্রথমটির উত্তরে বলি- আমি তো ঘটনাক্রম থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম না। অতীত দেখার জন্যে প্রয়োজন একটি প্রেক্ষিত, পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিকোণ। কিন্তু গত পঁচিশ বছরের ঘটনাবলীতে যুদ্ধ স্থিতি পেলো না জাতির জীবনে। প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ নিয়ে, যুদ্ধের স্বরূপ নিয়ে, নেতৃত্ব নিয়ে। প্রশ্ন তোলা হলো শত্রু নিয়ে, যুদ্ধের মিত্র নিয়ে। এতো বিতর্কে মুক্তিযুদ্ধটা সম্পৃক্ত হতে পারছে না জাতির অস্তিত্বে। থেকে যাচ্ছে স্মৃতি হয়ে। অতীত- কথা হয়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হয় না। ভুলবো না- এক ধরনের রোমান্টিকতা, আবেগ। যা হয়তো সত্যের চেয়ে বড়, সত্যের চেয়ে সত্য এবং সুন্দর। কিন্তু ঘটনার, আবেগের শিকলে এক ধরনের বন্দিত্ব আছে। ঘটনার অংশীদারিত্বের থেকে জন্মে, অধিকারবোধ। যা সময় ও ঘটনার ব্যাপকতা, সামগ্রিকভাবে সংকুচিত করে। অধিকারিত্ববোধ থেকে, অপ্রকাশ থেকে, ঘটনার সঙ্গে বসবাস করতে করতে নিজের অজ্ঞাতেই তা পুষ্পিত হতে থাকে নিজের ভেতর। স্মৃতিও আমাদের অবিনশ্বর নয়। লিখিত প্রকাশ না থাকলে সময়ে তার রূপান্তর ঘটে। পরিণত হয় রূপকে। সবার বয়স বাড়ছে। যুদ্ধের সময় যে যোদ্ধা ছিল সদ্য যুবক তার বয়স কম হলেও চল্লিশের নিচে নয়। বয়সে স্মৃতি শিথিল হয়েছে, অবলোকনের কেন্দ্র বদলে যাচ্ছে। চারদিক দেখলে শুনলে মনে হয় একাত্তরে যুদ্ধ যেন বিলুপ্ত প্রায় প্রজন্মের স্মৃতি নির্ভর লোকগাথা।

মনে হয়েছিল সবই মনে আছে। হ্যাঁ মনে আছে, যতটুকু মনে রাখতে চাই। এখানে আমি চারজনের কথা ভেবে শুরু করে এখন বাদ দিতে চাচ্ছি। কারণ চারজনের মধ্যে তিনজনের নামই মনে করতে পারছি না।

২৭ মার্চ, ১৯৭১।

দু'ঘন্টার জন্যে কারফিউ উঠেছে। মানুষ ছুটছে, পালাচ্ছে। আবার কারফিউ নামবে। অবরুদ্ধ হবে ঢাকা নগর। চলবে হায়েনাদের হত্যাযজ্ঞ। ঢাকা থেকে যতদূর যাওয়া যায়। বড় একটি নাগরিক অংশ পার হচ্ছে বুড়িগঙ্গা। ওপারে জিঞ্জিরা। নদী পার হলেই যেন শান্তির অববাহিকা।

কিন্তু ২৯ মার্চ কি ঘটলো জিঞ্জিরায়? ক'টা লেখায় আছে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেয়া অসহায় মানুষদের কথা? কেউ তো একটা গবেষণা করতে পারতো। একজন গবেষক তার ছাত্রদের নিয়ে তৈরি করতে পারতো মৃত্যুর খতিয়ান। কীভাবে মানুষ পালিয়েছিল, কীভাবে বেঁচেছিল।

বড় লেখা নেই। ইতিহাস নেই, উপন্যাস নেই। আছে এককের ভয়ার্ত কান্না, মৃত্যুগাথা। মোটা লাইনে লেখা হয় অনেকে মারা যায়, ধর্ষিতা হয়, হারিয়ে যায়। তথ্য নিশ্চয়তা নেই। যা ইতিহাসের উপাদান হবে না। হবে গাথা পুঁথি। হয়তো সমাজ দেহের গভীরে বিলীন হয়ে থাকবে। কিন্তু ইতিহাসে হয়তো একটি কি দুটি মাত্র লাইনে স্থান পাবে জিঞ্জিরার কথা।

আমাদের পরিবারের যাওয়ার কথা ছিল এ জিঞ্জিরায়। আমার পিতা আমাদের কোনো কিছুতে বাধা নিষেধ করতেন না, বিশেষ করে যদি মায়ের সমর্থন থাকতো। কিন্তু জিঞ্জিরায় যাওয়ার ব্যাপারে কেন যেন সিদ্ধান্ত দিলেন, 'না জিঞ্জিরায় যাওয়ার প্রয়োজনই নেই। ঢাকা নিরাপদ নয়, জিঞ্জিরাও না।' ২৮ তারিখে আমাদের দুধওয়ালা এলো। বললো,'আমি আপাদের নিয়ে যেতে এসেছি'। ওরা থাকে ত্রিমোহনী। তখন ঢাকার বাইরে একটি গ্রাম।

ছোট ছোট বিচ্ছিন্নতার ভেতরে অনুভবের সিম্ফনি ছিল। যেন এক নকসী কাঁথার মাঠ। লক্ষ কোটিবার বিদ্ধ হয়েই জন্ম নেয় এক অসামান্য সুন্দর। এ সুন্দর নতুন প্রজন্মের জন্যে আমাদের রেখে যাওয়া বিশ্বাস

এখন ঢাকারই অংশ। বাবা অবাক করে আমাকে ও আমার ছোটদের বললেন,'তোমরা ভাইবোনেরা চলে যাও'।

আমার তিন ভাই তিন বোন ত্রিমোহনী গেলাম।

আমরা গিয়ে দেখি দৈনিক পাকিস্তানের ফটোগ্রাফার মওলা ভাইও এসেছেন তাঁর পরিবার নিয়ে। একদিনেই তিনি নেতা হয়ে উঠেছেন। একদিনেই পুরো গ্রাম ভরে গেলো নগরের মানুষে। এরা ভীত নাগরিক, রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতা এবং বিদ্রোহী পুলিশ বাহিনীর পলাতক সদস্য। এই বিদ্রোহীরা ছিল গ্রামের সবচে' সংরক্ষিত অংশে লুকিয়ে। এদের খবর সবার কাছ থেকে গোপন রেখেছিল গ্রামবাসী। রাজনৈতিক নেতাও মহা উৎসাহে ওদের অবাক হয়ে দেখছিলেন। একটা কথার উত্তর পেলেই খুশি হচ্ছিলেন। ওরা যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজছে।

ভুলবো না- এক ধরনের রোমান্টিকতা, আবেগ। যা হয়তো সত্যের চেয়ে বড়, সত্যের চেয়ে সত্য এবং সুন্দর। কিন্তু ঘটনার, আবেগের শিকলে এক ধরনের বন্দিত্ব আছে। ঘটনার অংশীদারিত্বের থেকে জন্মে, অধিকারবোধ। যা সময় ও ঘটনার ব্যাপকতা, সামগ্রিকভাবে সংকুচিত করে। অধিকারিত্ববোধ থেকে, অপ্রকাশ থেকে, ঘটনার সঙ্গে বসবাস করতে করতে নিজের অজ্ঞাতেই তা পুষ্পিত হতে থাকে নিজের ভেতর। স্মৃতিও আমাদের অবিনশ্বর নয়। লিখিত প্রকাশ না থাকলে সময়ে তার রূপান্তর ঘটে। পরিণত হয় রূপকে

যুদ্ধক্ষেত্র আমরাও খুঁজছি। আমার ছোট ভাই একদিন খবর আনলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি দল এসেছিল তারাবো। আবার ফিরে গেছে ভৈরবের দিকে। ওখান থেকে তারা কিশোরগঞ্জ যাবে। সেখানে গিয়ে ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নেবে নতুন করে। দারুণ উদ্দীপক খবর। ওদিনই শুনলাম চট্টগ্রামের রেডিও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। খবর এলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুদ্ধ হচ্ছে। যুদ্ধ হচ্ছে পাবনায়, কুষ্টিয়ায়...। মনে হলো বাঙালিরা অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

পুলিশ ক'জনকে এক সকালে আর দেখা গেল না। হয়তো তারা যুদ্ধের খোঁজ পেয়ে গেছে। এতোগুলো ঘটনা ঘটলো দু'তিন দিনের মধ্যে। আমি মনে করতে পারছি সব ঘটনা। কিন্তু আগে পিছে হয়ে যাচ্ছে। এবং ভুলে গেছি সেই আশ্রয়দাতার নাম। আমার কাছে সে এখন ত্রিমোহনীর দুধওয়ালা। অথচ এখনো গেলে খুঁজে বের করতে পারি তাদের ঠিকানা।

কিন্তু কোনোদিন যাইনি যুদ্ধ শেষে।

মানুষে মানুষে মহাসঙ্গম যুদ্ধ শেষেই যেন শেষ হয়ে গেল।

নাম মনে নেই ষাটনলের সেই গেরিলার। সে ছুটিতে এসেছিল। একটি যুদ্ধে সবুজ ছায়ার মতো এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের পাশে রাইফেল হাতে। বলেছিল, 'স্যার আমি কোথায় থাকুম বইলা দেন'। গেরিলা শব্দটা ভাবলে আমি তাকেই কল্পনায় দেখি। অথচ নাম মনে নেই। আমরা ছিলাম চারজন। ওকে নিয়ে হলাম পাঁচজন। এই পাঁচজন মিলেই আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই।

চেহারাও মনে করতে পারি না বরড়া থানার সেই কিশোরীর। নাম তো মনেই নেই। আমি সারারাত হেঁটে বুট খুলে ঠান্ডা পানিতে পা দিয়েছিলাম। পা জমাট বেঁধে গেল। ভোরবেলা গরম পানিতে লবণ দিয়ে পায়ে সেক করেছিল মেয়েটি। বলেছিল, 'ভাই একেবারে ঠিক হয়ে যাবে, ভাইবেন না'।

নাম মনে আছে সেলিমগঞ্জের নজু ভাইয়ের। আফতাব ইঞ্জিনিয়ার আমার বন্ধু। আফতাবের আত্মীয় ও বন্ধু নজু ভাই। আফতাব চিঠি দিয়েছিল নজু ভাইকে। আমাদের ওপর দায়িত্ব তখন ঢাকা- মেলাঘর অলটারনেটিভ রুট বের করা। নির্ভয়পুর কোণাবন দিয়ে যাওয়া আসা করা যায়। তবে দূর হয়। চান্দিনা কাবিলা বাজার দিয়ে এখন চেক হচ্ছে। মেলাঘরের আর একটি রুট তৈরি হলো নদীপথে, সেলিমগঞ্জ হয়ে। মধ্যপথে হওয়ায় নজু ভাইকে ঢাকার সঙ্গে একজন লিয়াজোঁ হিসেবে দেখতেন হায়দার ভাই- মেজর হায়দার।

সেলিমগঞ্জের নজু ভাইকে ভুলি নাই। কিন্তু নজু ভাই নিজেই ভুলে গেছেন নিজেকে। যুদ্ধ শেষে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তারপর অনেকদিন দেখা নেই। বছর তিনেক আগে হঠাৎ এলেন অফিসে। কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার জীবনেও কোনো উদ্দেশ্য নেই। সবকিছুতেই নিস্পৃহ। শ্যামলীতে কোনো মতে থাকেন। যুদ্ধের কথা বলেন না। শোনেন না। শুধু ব্যর্থতার ছবি এঁকে চলে গেলেন। আবার আসতে বলেছিলাম। কিন্তু আর আসেননি। মনে হয়েছিল অনেকেই যুদ্ধ শেষে আর সমাজে নিজেকে 'অ্যাডজাস্ট' করতে পারেনি।

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে হারিয়ে গেছেন বা নামহীন হয়েছেন ত্রিমোহনীর জনৈক দুধওয়ালা। হারিয়ে গেছেন সেই নাম- না-জানা মেয়েটি, ষাটনলের জনৈক গেরিলা এবং জনৈক নজু ভাই নিজেই গেছেন হারিয়ে নিজের কাছেও।

সেই দুধওয়ালার স্মৃতিতেও হয়তো আমি নেই। অসংখ্য পরিবারকে তাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মনে রাখা কী সম্ভব? মেয়েটি কী ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাকে মনে রেখেছে?

মনে হয় না। আমরা পরস্পরের কাছে এখন নামহীন- গোত্রহীন।

কিন্তু একাত্তরের ঐকতান বাজে হৃদয়ে। আমাদের সবার ঐকতান।

'ভুলি নাই ভুলি নাই' বিচিত্রা প্রথম ছাপে '৭৩ ও '৭৪ সালে। পরবর্তী পর্ব ছাপা শুরু হয় স্বাধীনতার ২৫ বছরকে সামনে রেখে '৯৫ সাল থেকে । প্রায় তেরো মাস ধরে ছাপা হয়েছে অসংখ্য লেখা। যাদের অনুভব ছিল বা ছিল মনে রাখার মতো বয়স তারা লিখেছে যা এখনো মনে আছে।

চেনা-অচেনা ঘটনার একই ঐকতান। যে ঐকতান সমগ্র জাতিকে একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। যে ঘটনা এদেশে মানুষের কাছে, পরিবারের হৃদয়ে, স্মৃতিতে ছিল গোপনে সে ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র পাতায়। ছোট ছোট বিচ্ছিন্নতার ভেতরে অনুভবের সিম্ফনি ছিল। যেন এক নকসী কাঁথার মাঠ। লক্ষ কোটিবার বিদ্ধ হয়েই জন্ম নেয় এক অসামান্য সুন্দর। এ সুন্দর নতুন প্রজন্মের জন্যে আমাদের রেখে যাওয়া বিশ্বাস। নতুন প্রজন্মের গোলাম মোর্তোজা অনেক ঘটনার কিছু ঘটনা সংকলিত করেছে। তাকে শুভেচ্ছা জানানো প্রয়োজন।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

'ভুলি নাই ভুলি নাই' গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে শাহাদত চৌধুরী এই লেখাটি লিখেছিলেন।